পরিবেশ চেনার হাতে খড়ি হোক নিজের এলাকা দিয়ে

দীপক কুমার দাঁ

আমি থাকি গোবরডাঙ্গায়। উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া থানার অন্তর্গত। গত প্রায় ৩৫ বছর ধরে আমরা গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট নামের বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে নানা ধরনের প্রকৃতি পরিবেশ রক্ষা ও পর্যবেক্ষণের কাজ চালিয়ে আসছি।

আমাদের কাজের মধ্যে আছে (১) মৌমাছি পালন ও এদের বিষয়ে নানা ধরনের পর্যবেক্ষণ। কখন, কোন ফুলে এর পুষ্পরস (nectar) ও পরাগ (pollen) সংগ্রহ করে, চাক তৈরি, রানির ডিম পাড়া, চাকের পরিচর্যা, মৌমাছির রোগবালাই এসব নিয়ে আমাদের মধ্যে এমন অনেক মৌপালক ভাই আছেন যাঁরা উচ্চমানের বিশেষজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে বিহার, উড়িষ্যা, হিমালয়ের নানা দুর্গম এলাকায় পরিযায়ী মৌপালন (migratory bee keeping) এখন খুবই জনপ্রিয়। শুধু সুন্দরবন এলাকায় মে-জুন মাসে মৌ বাক্স আসে প্রায় ৬০ - ৭০ হাজার। এই সবকিছু মিলে আমাদের প্রকৃতি নির্ভর মৌপালন প্রয়াস আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত প্রয়াস হিসাবে স্বীকৃত।

এই কাজ করতে গিয়ে স্থানীয় গাছপালা নিয়ে আমাদের অনেক পর্যবেক্ষণ চালাতে হয়েছে। মরশুমের শুরু সেপ্টেম্বর থেকে কুলগাছের ফুল দিয়ে। কুলের ফুলে আছে প্রচুর পুষ্পরস ; কিন্তু পরাগ নেই বললেই চলে। সজনে, আম, লিচু, দ্রোণ, তিল, সরষে, ধনে, তাল, খেজুর রস এরা মৌমাছিকে দেয় প্রচুর পুষ্পরস, যা হল চাকে মধু তৈরির প্রধান উপাদান। পরাগকে বলা হয় মৌমাছির রুটি (Bee bread)। এটি হল প্রোটিন খাদ্য বিশেষ। সারা বছর নারকেল গাছ থেকে মৌমাছিরা প্রচুর পরিমাণে পুষ্পরস পায়। সরষে থেকে মৌমাছিরা পরাগ ও পুষ্পরস দুটোই পায় প্রচুর পরিমাণে। এখন ইউক্যালিপটাস ফুল মৌমাছিদের বিশেষ আকর্ষণ। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর এই তিনমাস থাকে এদের ফুল। বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া বা ঝাড়খন্ড, বিহারের ইউক্যালিপটাস জঙ্গলে মৌপালকরা হাজারে হাজারে বাক্স নিয়ে আসে ; দু'তিন মাস ক্যাম্প করে থাকে। প্রচুর মধু সংগ্রহ করে। একেই বলে পরিযায়ী মৌপালন (Bee migration) পদ্ধতিতে মধু উৎপাদন।

হ্যাঁ! যে কথাটা বলা হয়নি। এইসব মৌকলোনিতে থাকে 'এপিস মেলিফেরা' নামের ইতালি প্রজাতির বা ইউরোপের মৌমাছি। আমাদের দেশি মৌমাছি (এপিস সেরেনা ইণ্ডিকা) এখন আর বাক্সে পালন হয় না। একটা এপিস মেলিফেরা বাক্সে ৪/৫ মাসে কমবেশি ৫০ থেকে ৮০/৯০ কেজি পর্যন্ত মধু পাওয়া যায়। আর ডাঁশ মৌমাছিরা (এপিস ডরসাটা) হোল যাযাবর শ্রেণির। এদের বাক্সে পালন করা যায় না।

যে কোনও মানুষের জীবনে জীবিকা উপার্জনের পাশাপাশি থাকা চাই এক বা একাধিক শখ (hobby)। এর মাধ্যমে জীবনে আসে 'হাওয়া বদলের স্বাদ'। দৈনন্দিন

হাজারো একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি। অজানাকে জানার আনন্দ একবার যে পেয়েছে, সে আর কোনদিন এই নেশার হাত থেকে মুক্তি পাবে না। জ্ঞান আর আনন্দের মিশ্র অভিজ্ঞতায় তার জীবন ধন্য হবে। বিশ্বকবি বলেছেন, "বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা।" বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।

'হাওয়া বদল' কথাটা একটু বৃহত্তর ব্যাপকতায় গ্রহণ করলে এর বহুমাত্রিক তাৎপর্য পাওয়া যাবে। ১৯৬০ / ৬২ থেকে ১৯৭০ / ৭৫ অবধি দেখেছি কঙ্কণা বাঁওড়ের আচরায় মরা গরু / বাছুর / ছাগল ফেললে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে শ'য়ে শ'য়ে শকুন এসে জায়গাটা ভরিয়ে দিত। কয়েক ঘন্টায় খাওয়া শেষ। ৫/৭টা বড় হাড়গোড় পড়ে থাকতো। ৮০-র দশকের পর থেকে ক্রমে ক্রমে এখন নিশ্চিহ্ন কেন?

শকুন বড়ো প্রাচীন আম / তেঁতুল / বট / অশ্বত্থ / কামরাঙা / শিরিষ / মেহগনি গাছে বাঁসা বাঁধতো। এসব গাছের বয়স কমবেশি প্রায় একশো-দেড়শো বছর। এখন গ্রামেগঞ্জে প্রাচীন বুড়ো গাছ নেই বললেই চলে। দ্বিতীয় কারণ হল, একটি ওষুধ (ডিক্লোফেনাক) যা গরুর ব্যাথা নাশে মহৌষধ। কিন্তু এই মাংস শকুনদের শরীরে তীব্র বিষক্রিয়া করে। এ নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে, হচ্ছে। সুখের বিষয়, এখানে ওখানে দু'চারটে শকুনের দল ফের দেখা যাচ্ছে। শকুন অভয়ারণ্য গড়ে তোলা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের কেউ কেউ পায়ে পায়ে শকুনের খোঁজে গিয়ে 'হাওয়া বদল' সেরে নিচ্ছে।

কোথায় গেল সেই সব কাদাখোঁচা, খঞ্জন, বাটানের ঝাঁক? একটু আওয়াজ করলে ৫০/৬০টার ঝাঁকে উড়ে যেতো কাদাখোঁচারা। জলাভূমি সাফ করে ধানচাষ, পাট, সবজি ফসলের জন্য জমি ক্রমাগত ব্যবহার হতে লাগলো। বিষ তেলের ব্যবহার ক্রমাগত বেড়ে চললো। ওদের খাদ্যাভাব, পরিবেশগত সংকটের কারণে ওরা দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর একটা নির্মম নিষ্ঠুরতার কথাও বলতে হচ্ছে। ফাঁদ পেতে কাদাখোঁচা ধরে ঠাকুরনগরের বাজারে বিক্রি চলতো। পুঁটি মাছ বিষ তেলে ভিজিয়ে জলের ধারে ফেলে রাখা হত। গো বক, কোঁচ বক, কোরচে বক এরা খেয়ে বিষক্রিয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়তো। তখন ধরে বাজারে বিক্রি করা হত। এভাবেও এদেরকে শেষ করে দেবার প্রয়াস চলেছে দীর্ঘ সময় ধরে। এখনতো সবাই দুষ্প্রাপ্য!

একটা কথা বাজারে খুব চালু। তা হল 'সচেতনতা' (awareness) গড়ে তুলতে হবে আম জনতার মধ্যে। খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি, হাজারো পত্রপত্রিকা, জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই, পরিবেশ বিষয়ক সভাসমিতি / আলোচনা সভা এসব নিয়ে বহু কাজ হয়েছে। 'সচেতনতা'-র পরের ধাপ হল 'সক্রিয়তা'। এখানেই যত অলসতা, গড়িমসি, শিথিল-অপ্রতিবাদী-নিষ্ক্রিয় মানসিকতা। সক্রিয় প্রতিরোধ / প্রতিবাদ না থাকায় 'সচেতনতা' কথাটা এখন হাস্যকর হয়ে উঠেছে।

মাঝে চড়াই পাখি নিয়ে বেশ হৈ-চৈ হল। চড়াই কমছে মোবাইল টাওয়ারের জন্য। আসলে চড়াই বাসা করত পুরানো কড়ি-বরগাযুক্ত বাড়ির মধ্যে। এখন জানলায় নেট লাগানো। চড়াইয়ের ঢোকার উপায় নেই। দ্বিতীয়ত আধুনিক ফ্ল্যাট বাড়িতে, সিমেন্ট-কংক্রিটের গাঁথুনিতে চড়াইয়ের বাস্তুতন্ত্র উধাও। একটা উপায় অবশ্য বেড়িয়েছে। বাড়ির দেওয়ালের ভেন্টিলেটরে একটু সামান্য ভেঙে দিলে ওর মধ্যে চড়াই ঢুকে স্বচ্ছন্দে বাসা করে ডিম পেড়ে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। ঝুঁট শালিক শয়তানি করে ওদের বাচ্চা খেতে পারবে না। এভাবে অনেক জায়গায় পরিবর্তিত বাস্তুসংস্থানের সঙ্গে এরা মানিয়ে নিতে পেরেছে।

সন্ধ্যের বেশ আগেই পাখিরা রাতের নির্দিষ্ট নিরাপদ জায়গা বেছে নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকে। আজকাল দেখি রাত ৮টা/৯টা অবধি ফিঙে পাখিরা ইলেকট্রিক তারে বসে আছে আর আরামশে পোকা খাচ্ছে। স্বভাবের পরিবর্তন। 'প্রকৃতি সংসদ'-এর রিপোর্টে দেখছি। কলকাতার আশপাশে প্রায় পৌনে তিনশোর মতো পাখির প্রজাতি আজও আছে (২০১০ সাল অবধি)। এটা অনেক গেল গেল রবের মধ্যে বেশ আশাব্যঞ্জক। আমি তো গোবরডাঙায় গত ২০/২৫ বছরে রামগাঙরা, চশমা পাখি, ফটিক জল, নাচন, শ্যামা, নবরঙ এমন ২৫/৩০ প্রজাতির পাখি দেখিনি। ১৯৭৫ নাগাদ 'গোবরডাঙায় পাখি' শিরোনামে ১১০/১১৫টি প্রায় পাখির প্রজাতির তালিকা তৈরি করেছিলাম, যা দেখেছি। একাজে উৎসাহ দিয়েছিলেন প্রয়াত পক্ষীবিদ অজয় হোম মহাশয়। ওঁর স্নেহ-সাহচর্যে অনেক শিখেছি। দানে অকৃপণ ছিলেন। প্রচুর চিঠি দিতেন। 'প্রকৃতি জ্ঞান' নামে বেশ কয়েকবছর ওঁর সম্পাদনায় একটি দ্বিমাসিক কাগজ প্রকাশিত হত। প্রথমে, 'প্রকৃতি' পত্রিকা বের করেছিলেন বিখ্যাত সত্যচরণ লাহা মহাশয় ১৩৩২ নাগাদ। এটা সত্যিই গর্ব করার মতো বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা ছিল। দ্বিমাসিক এই পত্রিকায় ওই আমলের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা এতে লিখতেন। ভৌত বিজ্ঞান ও জীবন বিজ্ঞান - এই দুই বিষয়েই অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, যার অনেক কিছুই আজও প্রাসঙ্গিক। প্রায় ১২ বছর এই পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ পেয়েছিল। সাপ, পিঁপড়ে, মাছ ও প্রাণী-উদ্ভিদ নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বাংলার জীব সম্পদের বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ আছে।

কোনো জায়গার জীবসম্পদ (উদ্ভিদ ও প্রাণী) তালিকা প্রণয়নকে বলে — Bio Diversity Register. এই কাজ আমরা প্রাথমিকভাবে করেছিলাম ২০০৭ সালে। পরে ২০১০ নাগাদ এটিকে পরিবর্ধিত আকারে বের করেছি। এর ফলে স্থানীয়ভাবে চেনা জানার সুযোগ বেড়েছে।

প্রথমেই আছে 'মুখবন্ধ'। এখানে সংক্ষেপে ভৌগোলিক প্রাকৃতিক তথ্যাদি যেমন - মাটি, বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া, জনসম্পদ, জলসম্পদ, নদী-খাল-বিল, কৃষি এলাকা, ফলের গাছ, সামাজিক বনসৃজন এসব নিয়ে আলোচনা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিয়েও কথাবার্তা তুলে ধরা হয়েছে। এরপর আছে কার্যক্রম রূপায়ন পদ্ধতি প্রসঙ্গে (Work Plan)।

উদ্ভিদ সম্পদকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। (১) আমাদের ফুল (৮৯টি), (২) আমাদের ফল (৪৯টি), (৩) আমাদের খাদ্যে শাক ও পরিবেশ গুরুত্ব (৭২টি), (৪) বড়ো প্রাচীন গাছ (Trees) (৪২টি), (৫) আমাদের কৃষিজ সম্পদ (৫৮টি), (৬) গোবরডাঙ্গায় যেসব ঔষধি উদ্ভিদ পাওয়া যায় (৯৪টি), (৭)

এলাকার জলজ উদ্ভিদ (১৪টি), (৮) গৃহসজ্জার গাছ গাছালি (৪৫টি), (৯) হারিয়ে যাওয়া দেশি ধানের খোঁজে (আমন ধান - ৪২টি, আউশ ধান - ১৫টি), (১০) আমের জীব বৈচিত্র্য সম্পদ (৫২টি জাতের বিবরণ), (১১) বিবিধ ঃ উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সম্পদ - চাঁপা গাছ (৮টি), অন্যান্য (৮৬টি)। এছাড়াও সংযোজন করা হয়েছে - মাছ ধরার চার তৈরিতে লাগে ১৫/২০ রকম উদ্ভিদ মশলা, মেটে আলু - খামালু, কচু, বাঁশ সম্পদ ও অন্যান্য। মৌমাছিরা যেসব ফুলে পরাগ ও পুষ্পরসের খোঁজ পায় — সে রকম উদ্ভিদের তালিকা আমরা তৈরি করেছি ৫৬টি। সবশেষ রয়েছে - দেশজ চিকিৎসায় ঃ লোক প্রচলিত জ্ঞান (Traditional Peoples' Knowledge - Medicinal use) এমন ৪১টি গাছ। এই কাজটি তুলে ধরতে লেগেছে A4 সাইজ কাগজ ৮৭ পৃষ্ঠা। গ্রামের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে আমরা যেমন অনেক জেনেছি ও শিখেছি ; তেমনি উদ্ভিদ ও আয়ুর্বেদ বিষয়ক অনেক বাংলা বই থেকেও আমরা গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি। এই কাজটি আমাদের বেঁচে থাকার সজীবতায় স্বাদ বদলের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছে।

এবার আসি দ্বিতীয় ভাগের কাজ বিষয়ে। এটি হল প্রাণী সম্পদ বৈচিত্র্য তালিকা প্রণয়ণ। এখানে যে ভাবে বিষয় বিভাজন করা হয়েছে — (১) আমাদের পরিবেশের প্রজাপতি (৩৫টি) ; (২) আমাদের এলাকায় পাখি (৯২টি) ; (৩) আমাদের চুনোমাছ বা রাণিমাছ (৪৮টি) ; (৪) বাজারে লভ্য সামুদ্রিক মাছ বিষয়ে সমীক্ষা (৩০ রকম) ; (৫) সামুদ্রিক বা নোনাজলের মাছ (মোহনা) (১২ রকম) ; (৬) পোকামাকড়ের জগৎ ঃ আমাদের চারপাশে (৯৩ প্রজাতি) ; (৭) বন্য জীবজন্তু - যা আমাদের চারপাশে আছে (২৬ প্রজাতি) ; (৮) সরীসৃপ জগৎ (১৭ প্রজাতি) ; (৯) স্তন্যপায়ী গৃহপালিত পশু (১৪ প্রজাতি) ; (১০) বিবিধ ঃ প্রাণী জগৎ যা দেখা যায় (২১ প্রজাতি)। প্রত্যেকটি প্রাণী বা উদ্ভিদের বিষয়ে - নাম, ইংরাজি নাম, বৈজ্ঞানিক নাম, খাদ্যাভ্যাস, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক, বিপন্ন কি না, পরিবেশে গুরুত্ব, বাজারদর — প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। এর পরে যুক্ত হয়েছে — বিগত ১০০ বছরে গোবরডাঙার জনসম্পদের বিবর্ধন চিত্র। জনসম্পদ বৃদ্ধি মানে কৃষিজমির সম্প্রসারণ, বনবাদাড় উচ্ছেদ, ঘরবাড়ি-হাটবাজার-রাস্তাঘাট-গাড়িঘোড়ার দাপাদাপি। আর এসব কিছুই অতিদ্রুত বিনষ্ট করেছে বিপুল পরিমাণ জীবসম্পদ। আর্থিক কারণে বড় গাছ কাটা পড়ছে। এটাও প্রকৃতি নাশের অন্যতম প্রধান সূচক।

এই জৈব-বৈচিত্র্য তালিকায় সবশেষ যে, বিষয়টি রাখা হয়েছে তা হল বাংলা ভাষায় লভ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী বিষয়ক বই। নেই নেই করেও স্বাধীনতার পর থেকে আজ অবধি বাংলায় বিজ্ঞানের বই (ভালো মন্দ মিশিয়ে) কম বেরোয় নি। উদ্ভিদ বই - (ক) গাছপালা (সাধারণ) - ৪৭টি বই ; (খ) ফল বিষয়ক - (১৬টি) ; (গ) পুষ্পচর্চা (৪৫টি) ; (ঘ) উদ্ভিদ বিজ্ঞান ঃ উচ্চতর পঠন-পাঠন বিষয়ক (৪১টি) ; (ঙ) ভেষজ বিদ্যা ও আয়ুর্বেদ বিষয়ক (৩৬টি) ; বিবিধ (২০টি)। এর বাইরেও কিছু আছে, যে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

প্রাণী বিদ্যার বই — (ক) মৌমাছি পালন বিষয়ক (১০টি) ; (খ) গৃহপালিত পশু (৩২টি) ; (গ) হাঁস-মুরগি-শূকর-খরগোশ পালন (১৬টি) ; (ঘ) পাখি বিষয়ক (৬৪টি)

; (ঙ) কীট পতঙ্গ বিষয়ক (২৫টি) ; (চ) সরীসৃপ (সাপ, ব্যাঙ, কুমির, কচ্ছপ) - (২৫টি) ; (ছ) সাধারণ জীবজন্তু (১১৪টি) ; (জ) বনে জঙ্গলে শিকার বিষয়ক বা অন্যান্য (৪০টি) ; (ঝ) জীববিদ্যা - উচ্চতর পঠনপাঠন বিষয়ক (৬২টি) ; (ঞ) মাছ বিষয়ক বই (৩৫টি)।

সব মিলিয়ে, এই জীব বৈচিত্র্য তালিকা বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬৩ পৃষ্ঠা। আরও খেটেখুটে করলে, এর পৃষ্ঠা দাঁড়াবে ২০০ পৃষ্ঠা। এই কাজটি করার সময় আরও একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় নজরে এসেছে। মুদিখানার দোকান থেকে প্রত্যহ খাদ্য হিসাবে অনেক কিছু আমরা কিনি যার সরবরাহ আসে বাইরে থেকে, মুখ্যত ভিন রাজ্য থেকে। মানুষ এই খাদ্যগ্রহণ করে পুষ্টি লাভ করে এবং প্রয়োজন মেটায়। জীব বৈচিত্র্যের আলোচনায় এটাকেও মাথায় রাখা। আজকের পরিবেশ সুরক্ষা প্রশ্নে দৃষ্টিভঙ্গি হল - Think Globally, Act Locally.

অনেক রকম শাক (কুলে খাঁড়া, ব্রাহ্মী ইত্যাদি) এখন চাষ হয় ; কারণ বাণিজ্যিক চাহিদা আছে। আগেকার কৃষিকাজ এখন অনেক পাল্টে গেছে। কৃত্রিম সার ও কীটনাশক বিষ ব্যবহার পরিবেশ ও মাটির স্বাস্থ্য বিষিয়ে তুলেছে। জৈব চাষের আলোচনা ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। অনেক জায়গায় ব্যক্তি উদ্যোগে শুরু হয়েছে। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এখন একটি প্রধান ভাবনা। খাল, বিল, পুকুর সংস্কার করে জল ধরে রাখা। বাড়ির ছাদের জল মাটির তলায় ট্যাঙ্ক করে জমিয়ে রেখে অসময়ে ব্যবহার করতে হবে। ১০০০ বর্গফুট ছাদের জলে একটি ৪/৫ জনের পরিবার ৬/৭ মাস ভালোভাবে কাটিয়ে দিতে পারবে। এই কাজ অনেক রাজ্যে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বেহিসাবী ধান চাষ ইতিমধ্যেই প্রভূত জলসঙ্কট তৈরি করেছে। এ ব্যাপারে সতর্ক না হলে (ধানচাষ কমানো ও জল সঞ্চয়ে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ) ঘোর বিপদ তৈরি হতে আর দেরি নেই।

আম নিয়ে খোঁজখবর করতে গিয়ে দেখেছি বহু বিচিত্র জাতের, স্বাদ ও গন্ধের বৈচিত্র্যে ভরপুর নানারকম আঁটির আম গাছ ছিল, যা দ্রুত লোপ পাচ্ছে। আমের সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ জিনসম্পদ রক্ষা করা জরুরি। সারা ভারতে ১০,০০০ (প্রায়) আমের জাত (variety) আছে ; যা কিন্তু একটি মাত্র প্রজাতির অন্তর্গত (Mangifera indica)। এখন সর্বত্র আমচাষীরা হাতে গোনা গুটিকয়েক কলমের জাত - হিমসাগর, বোম্বাই, ল্যাংড়া, আম্রপালি, গোলাপখাস, লক্ষণভোগ, চৌসা ইত্যাদি বাগানে লাগায়। একে বলে 'মনো কালচার'। এটি একটি পরিবেশ নাশক প্রয়াগ। আঁটির আম গাছ রক্ষা করতে হবে - এই প্রচার জোরদার করা প্রয়োজন।

'হাওয়া বদল' বোঝাতে 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের নায়ক অমিত রে বলেছিল, "আমরা চলতি হাওয়ার পাখী। এই গতানুগতিক সর্বস্বতা আমাদের প্রতিদিন ক্ষয় করছে।" 'হাওয়া বদল' চাই এই ক্ষয়রোগের হাত থেকে মুক্তির স্বাদ আনতে। ভুললে চলবে না মানুষ প্রকৃতির দাস। প্রকৃতি মানুষকে রক্ষা করে। সেজন্য প্রকৃতিকে (nature) জেনে বুঝে, প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব করে আমাদের এগোতে হবে। বন্যা রোধে বাঁধ নয়। এতে নদীর দ্রুত অপমৃত্যু হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, "ছোটো আকারে বন্যা ভাল।" বন্যার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলো। এতেই বেশি উপকার পাওয়া যায়। জমির উর্বরতা, মাছের বংশ বৃদ্ধি, নদীর নাব্যতা, সব কিছু বজায় থাকবে নদীর সঙ্গে মিতালি করে চলতে পারলে। এভাবেই নতুন ভাবনায় মাঝেমধ্যে হাওয়া বদলে ক্ষতির বদলে লাভ বেশি।